ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1179-1183
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.119

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মায়া ও আত্মজ্ঞান লাভের পথ অনুসন্ধান

সন্তু কান্ডার, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.05.2025; Accepted:27 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

Swami Vivekananda, one of the most prominent spiritual leaders of modern India, greatly explored the concept of Māyā from the Advaita Vedanta. Māyā according to him is the ignorance that ties individuals to the material world, without realizing their true divine nature. This ignorance manifests through attachment to impermanent occurrences, identification with the physical body, and ignorance of the ultimate reality- Brahman.

Vivekananda emphasized that if someone wants to attain Ātmā-Jñāna or self-realization then he must be overcoming Māyā. He was an Advatin. According to Advaita Vedanta living beings (Jivātma) are identical with Brahman (Paramātmā). He proposed different paths like, knowledge (Jñāna), devotion (Bhakti), selfless action (Karma), and meditation (Raja Yoga) for liberation. Vivekananda said that service to humanity is a powerful means to transcend ignorance or Māyā. He believed that perceiving the divine in all beings and work unselfishly for the welfare of others leads to purification of the mind, finally bringing one closer to self-realization. In present day, when we are going through the critical situation Vivekananda's teaching is very relevant. His philosophy provides us a pathway to inner peace and self-realization. His teachings encourage us to rise above ignorance and illusion, finding truth through wisdom, love, and selfless action. So, according to Swami Vivekananda, liberation from Māyā and the attainment of Ātmā-Jñāna is not just a theoretical practice but a practical journey of self-discipline, selfless service, and deep concentration. By following this path, one can transcend illusion and realize his own nature.

Keywords: Advaita Vedanta, Brahman, Māyā, Self-realization, Liberation

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মাটিতে আর্বিভূত মহাপুরুষদের মধ্যে একজন অন্যতম মহান দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তক। তিনি তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা ভারতীয় দর্শন ও বেদান্তের গভীর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তবে তাঁর শিক্ষা ও ভাবনায় যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে তা হল 'মায়া ও আত্মজ্ঞান' বিষয়ক আলোচনা। 'মায়া' হল সেই বিভ্রম বা ভ্রান্তি যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মপরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অন্যদিকে 'আত্মজ্ঞান' হল সেই চেতনা বা উপলব্ধি যা আমাদের নিজেদের প্রকৃত স্বরপকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, আত্মজ্ঞান লাভ বা নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। ফল স্বরূপ সে তাঁর জীবনের পরম উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আলোচ্য এই প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মায়ার প্রকৃত স্বরূপ ও আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

১৮৬৩ সালে **১২ই** জানুয়ারি কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে আর্বিভূত এক মহাপুরুষ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অত্যন্ত মেধাবী বিবেকানন্দ বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। শস্য-শ্যামলায় পরিপূর্ণ রমণীয় এই বিশ্বজগতের দিকে তাকিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, তা এক বিচিত্র শোভায় সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে। প্রতিটি মানবই নিয়ত প্রকৃতির এই সৌন্দর্য সুখ সম্ভোগ করে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির এই বিচিত্র রূপে মুগ্ধ তাঁর হৃদয়ে বারবার তাই নানান প্রশ্নের উদয় হয়েছে, - দৃশ্যমান এই জগত প্রপঞ্চের রহস্য কী? কে এই প্রপঞ্চের স্রষ্টা? কেমনভাবে তিনি এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করলেন? ঈশ্বর বলে আদৌ কি কিছু আছে? দৃশ্যমান এই জগত কি কেবলই মায়া? মুক্তি কিভাবে সম্ভব? – প্রভৃতি নানান প্রশ্ন প্রায়শঃই তাঁকে উদ্বেলিত করে তুলত।

তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তাঁর চিন্তা ভাবনার মূল ভিত্তিভূমি- ই ছিল উপনিষদ ও বেদান্ত। তাঁর সমস্ত বিশ্বাসের মূলে রয়েছে এক অদ্বয় সত্যের প্রতি গভীর আস্থা। সমস্ত কিছুকে তিনি একের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন। জগত সর্ম্পকে তাঁর অভিমত, জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে অতিন্দ্রীয় বিষয়ের তফাৎ, মায়া বা অবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন ব্যাখ্যা– সবই তিনি দিয়েছেন অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে। তবে তিনি যুগ ও সময়ের প্রয়োজনে বেদান্তের এক নব ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী হলেও বেদান্তের এর এক নব রূপ জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলতেন –

> “একটিমাত্রই বস্তু আছে- তাহাই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তাহাকে আত্মাই বল আর বস্তুই বল বা অন্য কিছুই বল, জগতে কেবলমাত্র তাহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নাম-রূপ- উপাধিবশতঃ ‘বহু’ প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটি তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক দেখাইতেছে কেন? নাম ও রূপ– তরঙ্গের আকৃতিই রূপ, আর আমরা উহার নাম দিয়াছি ‘তরঙ্গ’, এই নাম-রূপই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়াছে। নাম-রূপ চলিয়া গেলেই তরঙ্গ যে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রই হইয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমগ্র জগত এক সত্তা। নাম-রূপই যত পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্যের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তেমনি সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা অসংখ্য নাম- রূপের বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা রূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু স্বরূপতঃ উহা এক । বাস্তবিক ‘আমি’ বা ‘তুমি’ বলিয়া কিছু নাই– সবই এক। হয় বল– সবই আমি, না হয় বল– সবই তুমি।[১]”

অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী হলেও জগৎ বিষয়ে বিবেকানন্দের অভিমত ছিল অদ্বৈতবাদীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ ব্যবহারিক দিক থেকে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও পারমার্থিক দিক থেকে তাঁরা জগতের কোন সত্তায় মানতেন না। কিন্তু বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক এই দুই অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে। তিনি অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হলেও জাগতিক সত্যতাকে কখনই অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, তিনিই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। আর একথা সত্য যে উপলব্ধির দিক থেক স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন তফাৎ থাকেনা। অর্থাৎ তিনি অদ্বৈতবাদীদের মত জগতকে অমায়িক বলতেন না।

তিনি মনে করতেন নিছক শূন্য থেকে কোন কিছুর উৎপত্তি হয়না। অর্থাৎ কারণ ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণই কার্যের মধ্যে অন্য এক রূপে উপস্থিত হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্যও তেমনি পূর্ববর্তী কোন সূক্ষ কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কেননা সকল কার্যবস্তু উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে সূক্ষরূপে বর্তমান থাকে। সমস্ত বস্তু যাদের আমরা উৎপন্ন হতে দেখি তারা অনন্তকাল ধরে আছে এবং থাকবে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ কারণ হল চৈতন্য। সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যে অবক্ত্যরূপে বর্তমান ছিল আর সৃষ্টির মাধ্যমে তা আমাদের কাছে ব্যক্তরূপে ধরা দেয়। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিতরূপে থাকে আর শেষে তা ক্রমবিকশিত হয়। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা জগতরূপে যে চৈতন্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে তা সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যেরই অভিব্যাক্তি। আর এই সর্বব্যাপী চৈতন্যই হল ঈশ্বর। জগতে আমরা যা কিছু দেখি, জড়, শক্তি, মন চৈতন্য প্রভৃতি নানান বস্তু সবই সেই চৈতন্যেরই প্রকাশ। যা আমরা দেখছি, শুনছি বা অনুভব করছি সবই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, আরও স্পষ্টভাবে বলে গেলে সবই তিনি।

অদ্বৈত বেদান্তে ঈশ্বরের কথা বলা হলেও তা ছিল অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রসূত। অদ্বৈত মতে ঈশ্বর হলেন সগুণব্রহ্ম। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে অসীম ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। এমনকি তাঁর কাছে ঈশ্বর অবিদ্যা প্রসূতও নয়। আসলে আমাদের এরূপ বিভাজনের পিছনে রয়েছে আমাদের অজ্ঞতা ও সীমিত উপলব্ধি। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হলে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি যে, অসীম ব্রহ্ম যেমন সত্য ঈশ্বরও তেমনি সত্য। তাঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। বিবেকানন্দের ভাষায়,-

> "সগুণ ঈশ্বর মায়ার মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাতীত আর কিছু নন। মায়া বা প্রকৃতির অধীন হইলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে 'জীবাত্মা' বলে এবং মায়াধীশ বা প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই 'ঈশ্বর' বা সগুণ ব্রহ্ম। যদি কোন ব্যাক্তি সূর্য দেখিবার জন্য এখান হইতে যাত্রা করে, সে প্রথমে সূর্যকে ছোট দেখিবে; যতদিন না আসল সূর্যের নিকট পৌঁছিতেছে, ততদিন উহাকে ক্রমশঃ বড় হইতে বড় দেখিবে। যতই সে অগ্রসর হয়, ততই সে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু সে যে একই সূর্য দেখিতেছে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম- সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র, সুতরাং সেই হিসাবে সেগুলি সত্য। ইহাদের মধ্যে কোনটিই মিথ্যা নয়, তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, এগুলি নিম্নস্তরের অবস্থা মাত্র।"[২]

তিনি মনে করতেন ঈশ্বর সমস্ত স্থানে, সমস্ত বিষয়ে উপস্থিত। আকাশ, বাতাস, সূর্য সবই এই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে তাদের কার্য সম্পাদন করে থাকে।

অর্থাৎ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান এই জগত প্রপঞ্চ অবিদ্যা বা মায়া প্রসূত নয়। মায়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মায়া শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। প্রচীন বৈদিক যুগে মায়া শব্দটি 'কুহক' অর্থে ব্যবহৃত হত। সেখানে আমরা লক্ষ্য করি এই মায়ার দ্বারা ইন্দ্রের নানান রূপ ধারণের কথা। মায়া শব্দটির দ্বারা সেখানে ইন্দ্রজাল বা অনুরূপ কোন অর্থ বোঝান হত। পরবর্তিকালে মায়া শব্দটি আবার ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শেতাশ্বতর উপনিষদে 'মায়া' শব্দটির দ্বারা প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে আর 'ময়ী' শব্দের দ্বারা মহেশ্বরকে বোঝানো হয়েছে। আবার বৌদ্ধ দর্শনে মায়া কে বলা হয়েছে কল্পনামাত্র। অদ্বৈতবাদীরা মায়াকে ভ্রম সৃষ্টিকারী শক্তি বলতেন। তাঁদের মতে এই মায়ার দ্বারাই মিথ্যা জগৎ আমাদের কাছে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বিবেকানন্দ মায়া বলতে এরূপ কোন কিছু বুঝতেন না। তাঁর কাছে মায়া হল জাগতিক ঘটনাসমূহের বর্ণনামাত্র। অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে বা এই সংসারের যাবতীয় ঘটনাসমূহ যেভাবে ঘটে চলেছে মায়া কেবল তারই বর্ণনা মাত্র। তাঁর ভাষায়,-

> "মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত একটি মতবাদ নহে; সংসারের ঘটনা যেভাবে চলিতেছে, মায়া তাহারই বর্ণনামাত্র অর্থাৎ ইহাই বলা যে, বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্বত্র এই ভয়ানক বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেখানেই অমঙ্গল। যেখানে অমঙ্গল, সেখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন, সেখানেই ছায়ার মতো মৃত্যু তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকে কাঁদিতে হইবে; যে কাঁদিতেছে, সে হাসিবে। এ অবস্থার প্রতিকারও সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি – যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না; যেখানে আমরা কেবল হাসিব, কাঁদিব না। কিন্তু যখন এই সকল কারণ সমভাবে সর্বত্র বিদ্যমান, তখন এরূপ সজ্ঘটন স্বতই অসম্ভব। যেখানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি আছে , কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যেখানে সুখোৎপাদক শক্তি বর্তমান, দুঃখজনক শক্তিও সেইখানে লুক্কায়িত।"[৩]

জগতের প্রতিটি মানুষ এরূপ বিরোধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর প্রতিকার কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমাদের সমগ্র জীবন এরূপ সৎ ও অসৎ, ভাল ও মন্দ প্রভৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের সমাহার। আমরা এমন কোন জগতের কথা বলতে পারিনা, যেখানে কোন দুঃখ নেই, কেবল আনন্দই বিরাজমান। জাগতিক বিষয়সমূহ কখনো সত্য বলে মনে হয় আবার কখনো মনে হয় মিথ্যা। কখনো আনন্দময়, কখনো আবার দুঃখজনক। কখনো মনে হয় আমরা

জাগ্রত আবার কখনো মনে হয় নিদ্রিত। এইভাবে প্রতিনিয়ত যে আলো ও অন্ধকারের খেলা চলছে – তার বর্ণনামাত্রই হল মায়া।

প্রতিটি মানুষই কোন না কোনভাবে মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই সংসার সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, ভাল, মন্দ প্রভৃতি বিরুদ্ধ বিষয়েরই সংমিশ্রণ। একটি বাড়লে অন্যটিও সেই সাথে বৃদ্ধি পাই। এই সংসারে আমরা, কেবল সুখ কিংবা কেবল দুঃখ এমন কিছু পাইনা। কেননা সুখ, দুঃখ– এগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন পৃথক সত্তা নয়। তাই এই সংসারে আমরা এমন কোন বস্তু পাইনা যা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক,- এমন ধারণা স্ববিরোধী। কেননা যে বিষয়টি আজ ভালো বলে মনে হচ্ছে কাল তা মন্দ হতে পারে। একটি ঘটনা যা আজ শুভ বলে মনে হচ্ছে কাল তা অশুভ মনে হতে পারে। একই বস্তু যা একজনকে সুখ প্রদান করছে তা অপরকে দুঃখ দিতে পারে। যে অগ্নি দগ্ধ করে সেই অগ্নিই আবার অনাহার ক্লিষ্ট ব্যক্তির আহার প্রস্তুত করতে পারে। যদি কেউ মৃত্যু বরণ করতে চাই তাঁকে জীবনও ধারণ করতে হবে। কেননা দুঃখহীন সুখ ও মৃত্যুহীন জীবন কোনভাবেই সম্ভব নয়। আজ আমার কাছে যে জিনিস সুখকর কাল তা দুঃখজনক হতে পারে। সুতরা আমাদের বর্তমান অবস্থা যেমন সম্পূর্ণ সত্য নয় তেমনি তা সম্পূর্ণ অসত্যও নয় – উভয়ের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ আমাদের জীবন সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি ঘটনার সংমিশ্রণমাত্র। এরূপ মায়াপাশে আমরা সকলে আবদ্ধ।

কিন্তু প্রশ্ন হল সংসার যদি এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থার সংমিশ্রণ হয় তবে আমরা কর্ম কেন করব? অর্থাৎ অকল্যাণ ছাড়া যদি কল্যাণকে না পাওয়া যায়, সুখ উৎপন্ন করলে যদি দুঃখও উৎপন্ন হয় তবে কর্মের আবশ্যকতা কি? উত্তরে বেদান্তে বলা হয়েছে, আমাদের পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রা করতে হবে। আমরা কেবল পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ মানবই নয়, আমাদের এর চেয়ে এক উচ্চতর অবস্থান রয়েছে। আর আমাদের উচিৎ সেই উচ্চতর আর্দশ ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ শুধু ভাল-মন্দ বা শুভ-অশুভেরই কেবল অস্তিত্ব আছে তা নয়– এর বাইরে রয়েছে এক উচ্চতর সত্তা, সেটাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ নিজেকে মুক্ত করা। আমরা কেউই প্রকৃতির দাস নই, ছিলাম না আর হবও না। প্রকৃতিকে আপাতদৃষ্টিতে অসীম মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অসীম নয়, সসীম। সমুদ্রের সাথে তুলনা করে বলা যায়, তা একটা বিন্দুমাত্র। আর মানুষ হল স্বয়ং সমুদ্রস্বরূপ। মানুষ যখনই একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে তখনই শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ সবই জয় করতে সমর্থ হবে। মানুষ তাঁর নিজের চোখে হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে অন্ধকার। হাত সরিয়ে নিলেই সে আলো দেখতে পায়। অর্থাৎ তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টকে নির্মাণ করতে সমর্থ। মানুষ তার চারপাশের জগতের দিকে তাকালে অনুভব করতে পারে যে, সে বন্দি। সে এও অনুভব করে তার অন্তরে কে যেন রয়েছে সে চাইছে এই বন্দিদশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাই বলা হয়েছে,-

> "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
> আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।।"[৪]

অর্থাৎ হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি; যিনি অন্ধকারের পারে, তাহাঁকে জানিলেই মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ বলতেন জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আত্মাই সত্য। তিনিই একমাত্র শুদ্ধ সত্তা। তিনি নিম্নতর প্রাণী কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে উচ্চতর প্রাণী মানুষ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রতিবিম্বিত করে চলেছেন। জগতে তিনিই একমাত্র সত্য। জগতের প্রতিটি মানুষই স্বয়ং ব্রক্ষস্বরূপ। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে বলে মানুষ তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনা। এই মায়া বা অজ্ঞান বা অবিদ্যা থেকে যদি আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি তবেই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। তাই ভেদজ্ঞান একটি মিথ্যা প্রতীতিমাত্র।

মানব দেহ, দেহ, মন ও আত্মা– এই তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত। দেহ আত্মার বর্হিঅঙ্গ আর মন আত্মার অর্ন্তঅঙ্গ। এই আত্মাই মন নামক অন্তঃকরণের দ্বারা দেহকে চালিত করে থাকে। কিন্তু আত্মার প্রকৃতপক্ষে কোন জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। এমনকি তাঁর কোন বন্ধন নেই, তা এক শাশ্বত সত্তা। আমরা প্রায়শঃই আকাশে নানা বর্ণের মেঘের উদ্ভব হতে দেখি, কিন্তু সেই সকল বিচিত্র বর্ণের মেঘের অবস্থান আকাশে ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণের জন্য তা অবস্থান করলেও পরবর্তিকালে তা আর থাকে না, কিন্তু আকাশের নীল রঙের কোন পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনি আত্মার কোন পরিবর্তন হয়না। তা এক অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্তা। তবে বিবেকানন্দ বলতেন, আত্মা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত

সত্তা হলেও তা নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে গমন করে। বিবেকানন্দ মনে করতেন আত্মজ্ঞান লাভই হল মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য। কিন্তু মায়া বা অবিদ্যার কারণে মানুষ আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম হননা। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বিবেকানন্দ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম, ধ্যান ও যোগ সাধনা, গুরুর উপদেশ পালন ও শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রভৃতি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ের নির্দেশ করেছেন। এগুলি ঠিক ঠিক ভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে একজন ব্যাক্তি বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন বা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

মানুষ যখন তার বন্ধনদশা ছিন্ন করতে পারে তখনই সে মুক্ত হয়। বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদীদের মত দু ধরণের মুক্তি মানতেন- জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি। দেহ থাকাকালীন অবস্থায় যে মুক্তি তা হল জীবন্মুক্তি। আর দেহের বিনাশে যে মুক্তি তা হল বিদেহ মুক্তি। জীবন্মুক্ত পুরুষ যে সকল কর্ম সম্পাদন করেন তা তাঁকে প্রভাবিত করে না। তিনি অনাসক্ত হয়ে কাজ করে থাকেন। পদ্ম পাতা জলে অবস্থান করলেও জল যেমন তাকে সিক্ত করতে পারেনা, জীবন্মুক্ত পুরুষও ঠিক তেমন। তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কখনো কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

সুতরাং পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মায়া হল সেই অজ্ঞানের আবরণ, যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আত্মজ্ঞান মধ্য দিয়েই মানুষ এই মায়ার জাল ছিন্ন করে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তিনি সাধনা, আত্মচিন্তা, নিঃস্বার্থ কর্ম ও গুরুর উপদেশ পালনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর এই শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করলে আমরা মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে আত্মদর্শন লাভের মাদ্যমে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারি।

তথ্যসূত্র:

১। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৮তম পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২, পৃ.- ৩৮

২। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৮তম পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২, পৃ.- ২৬৬

৩। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৮তম পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২, পৃ.- ৯

৪। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ- ২/৫

গ্রন্থপঞ্জী:

১। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৮তম পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১২

২। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১২

৩। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (চতুর্থ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৪তম পুনর্মুদ্রণ, মে ২০১২

৪। বিবেকানন্দ, স্বামী, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৫তম পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১২

৫। বিবেকানন্দ, স্বামী, বেদান্তের আলোকে, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৫তম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৬। বিবেকানন্দ, স্বামী, বেদান্ত কি এবং কেন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০তম পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫

৭। ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী, বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬

৮। বিবেকানন্দ, স্বামী, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, ২০১৪

৯। Lal, Basant Kumar, Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarasidass, Delhi, 9th Reprint, 2013

১০। Ranganathanand, Swami, Pracital Vedant and The Science of Values, Advaita Ashrama, Kolkata, February 2012